ইসলাম আপনাকে যেভাবে দেখতে চায়

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাঈম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

আল্লাহওয়ালা মানুষ গঠন **১১**

- ঈমান ও বিশ্বাস ১১
- ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান ১৪
- চরিত্র ও নৈতিকতা ১৭
- আইন ও আইনের উদ্দেশ্য ২০
- প্রচার ও প্রসার ২৩
- জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ২৭
- নির্মাণ ও উৎপাদনশীলতা ৩৫

আদর্শ পরিবার গঠন **৪০**

- ক্ষতিকর ও আদর্শবিবর্জিত ধারণা ৪০
- ইসলামে বিবাহের বিধান ৪১
- বিবাহর উদ্দেশ্য ৪২
- যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য কিছু উপদেশ ৪৯

আদর্শ সমাজ বাস্তবায়ন **৬৫**

- মৌলিক মূল্যবোধসমূহ ৬৫
- ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ ৭১
- সহানুভূতি ও সহমর্মিতা ৭৩
- স্বনির্ভরতা ও সংহতি ৭৫
- পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও সদুপদেশ ৭৬
- পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচার ৭৬
- ন্যায়বিচার ৭৭
- উন্নত সমাজ ৭৮
- উন্নয়ন ও জীবনের উদ্দেশ্য ৭৮
- জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৭৯
- সমন্বিত উন্নয়ন ৭৯

আদর্শ জাতি গঠন **৮১**

- কুরআনে উল্লিখিত মুসলমানদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৮৩
- জাতীয় চেতনায় বিশ্বাস ৯১

◈ হাসান আল বান্না (রহ.)-এর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ ৯৩
◈ আরববাদের বৈশিষ্ট্য ৯৬

আদর্শ রাষ্ট্র গঠন ৯৭
◈ ইসলাম যা বলে ৯৯
◈ ঐতিহাসিক দলিল ১০২
◈ ইসলামের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে দলিল ১০৫
◈ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ১১০

মানবতার সমৃদ্ধিতে ইসলাম ১১২
◈ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত ১১৫
◈ ভ্রাতৃত্ব ও সমতা ১১৭
◈ সকলের প্রতি ন্যায়বিচার ১২০
◈ বিশ্বশান্তি ১২৩
◈ অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণুতা ১২৮
◈ সহনশীলতার সর্বোচ্চ মাত্রা ১৩১
◈ সহনশীলতার স্পৃহা ১৩২
◈ সহনশীলতার মৌলিক চিন্তা ১৩৪

আল্লাহওয়ালা মানুষ গঠন

ইসলামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহওয়ালা মানুষ গঠন করা। এই মানুষ সর্বদা আল্লাহর নজরবন্দিতে থাকবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন, যাকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, দুনিয়ার সবকিছু যার অনুবর্তী করা হয়েছে। সে হবে এমন মানুষ, যার মধ্যে মানবতার যাবতীয় গুণাগুণ বিদ্যমান থাকবে; পাশবিকতার ন্যূনতম গন্ধও থাকবে না। এমন মানুষ দিয়েই তৈরি হয় আদর্শ পরিবার, সমাজ ও জাতি।

ঈমান ও বিশ্বাস

একজন মুসলিমের প্রধান পরিচয় হলো সে বিশ্বাসী। নিজের ও চারপাশের বিশ্ব নিয়ে যার রয়েছে স্পষ্ট ধারণা। সে বনে-বাদাড়ে গজিয়ে ওঠা চাষিহীন কোনো লতাপাতা নয়। তার চারপাশের পৃথিবী এমনি এমনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। তার জগৎটা এমন কোনো জগৎ নয়, যার কোনো নিয়ন্তা নেই; বরং একজন মুসলিম বিশ্বাস করে—একজন রব আছেন; যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরিশুদ্ধ করেছেন, পথ দেখিয়েছেন। তাকে বিচার-বিবেচনার শক্তি দান করেছেন, ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দান করেছেন। তাকে সুপথের দিশা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন, প্রেরণ করেছেন আসমানি কিতাব। তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এমনি এমনি সৃষ্টি করা হয়নি।

মানুষ একটি চমৎকার সৃষ্টি। আর এই চমৎকার সৃষ্টির রয়েছেন একজন চমৎকার সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষসহ সবকিছুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুকে নিজস্ব স্বকীয়তা দিয়ে বানিয়েছেন। আবার এত এত সৃষ্টিকে তিনিই ধ্বংস করবেন। এই জগৎকে বদলে দেবেন আরেকটি নতুন জগৎ দিয়ে। যেই জগতের শুরু আছে; কিন্তু শেষ নেই। সেই জগতে সকলকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে প্রত্যেকেই ভোগ করবে নিজ নিজ কর্মফল।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ- اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ-

‘আর আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ! যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আমি কি তাদের জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকিদের পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব?’[১]

অন্যত্র তিনি বলছেন—

[১] সূরা সোয়াদ : ২৭-২৮

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا-

'তোমাদের বাসনা আর আহলে কিতাবদের বাসনা কোনো কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি কোনো কুকর্ম করবে, সে তার বিনিময় প্রাপ্ত হবে। সে আল্লাহ ছাড়া তার জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও না। আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বিচির আবরণ পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।'[২]

একজন মুসলিম আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর সকল নবি-রাসূল ও আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস করে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে, তিনি যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তাতে। সে বিশ্বাস করে, তাকে একদিন আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা সকলকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন। আল্লাহর সামনে সেদিন ব্যক্তির ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; কাজে আসবে কেবল তার ঈমান ও আমল। কুরআন বলছে—

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا- وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا-

'সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাঁর সুপারিশ ছাড়া কারও সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। তিনি তাদের আগের ও পরের সবকিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। আর চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে, যে জুলুম বহন করবে। আর যে মুমিন অবস্থায় ভালো কাজ করবে, সে কোনো জুলুম বা ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।'[৩]

এই ঈমান মুমিনের হৃদয় আলোকিত করে। মুমিনের ঈমান তাওহিদের ঈমান। তাওহিদ মানে হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। প্রথমটি হলো—আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস। আর দ্বিতীয়টি হলো, তিনি ছাড়া আর কারও দাসত্ব না করা। তাওহিদের এ দুটি দিক একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আরব মুশরিকরাও বিশ্বাস করত, আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। কুরআনের ভাষায়—

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ-

---

[২] সূরা নিসা : ১২৩-১২৪

[৩] সূরা ত্ব-হা : ১০৯-১১২

‘তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে আসমানমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?’[৪]

সুতরাং তারা আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস করত। কিন্তু ইবাদত করত একাধিক দেব-দেবীর। এসব দেব-দেবীর অস্তিত্বের কোনো দলিল তাদের কাছে ছিল না। তারা কেবল বলত—

هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ-

‘এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।’[৫]

তারা আরও বলত—

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى-

‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।’[৬]

কিন্তু ইসলাম বলছে, ইবাদত হবে কেবল আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, কোনো কিছুর ইবাদত করা যাবে না। কোনো মানুষেরও, সে যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, ইবাদত করা যাবে না। ইসলাম মানুষকে পশুপূজা, শয়তানের পূজা, আগুনপূজা, প্রকৃতিপূজা, প্রবৃত্তিপূজাসহ সব ধরনের পূজা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এসব কিছুর অর্থ হলো, মুসলমান কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে। সে কখনোই আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। এজন্যই আল্লাহর রাসূল (সা.) যত রাজা-বাদশার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, সবাইকে একই বার্তা দিয়েছেন—

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ-

‘হে কিতাবিরা! তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করি। আর তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করি।’[৭]

ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান

একজন মুসলমান জানে ও মানে, দুনিয়া এবং এর সবকিছু আল্লাহ তায়ালা তার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিনিময়ে তারও কিছু কর্তব্য আছে। আছে কিছু আচার-অনুষ্ঠান, কিছু কর্মবিধি। তাকে সৃষ্টি করার পেছনে রয়েছে একটি মহান উদ্দেশ্য। আর এটিই হলো জীবনের রহস্য।

---

[৪] সূরা আনকাবুত : ৬১

[৫] সূরা ইউনুস : ১৮

[৬] সূরা জুমার : ৩

[৭] সূরা আলে ইমরান : ৬৪

মানুষ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক আল্লাহর ইবাদত করা। আর মানুষ যেন নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য আসমান-জমিনের সবকিছুকে তার আজ্ঞাবহ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ- مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ-

'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে রিজিক চাই না, আর আমি এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে; বরং রিজিক তো দেন আল্লাহই। তিনি শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।'[৮]

আমরা যদি লক্ষ করি, তবে দেখতে পাব—সৃষ্ট সবকিছুই একে অপরের সেবায় নিয়োজিত আছে, একে অপরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আলো-বাতাস-পানি কাজ করছে গাছপালার জন্য। গাছপালা কাজ করছে পশু-পাখির জন্য। আবার পশু-পাখি কাজ করছে মানুষের জন্য। তাহলে মানুষ কাজ করবে কার জন্য? মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর কাজ করার জন্য, একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। এই ইবাদতে আর কাউকে এবং অন্য কিছুকে শরিক করা যাবে না। শুধু এই অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন বহু নবি-রাসূলকে—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

'প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো।'[৯]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

'আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহি নাজিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।'[১০]

সুতরাং একজন মুসলিম কেবল আল্লাহতেই নিবেদিত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তাঁর প্রতি যথাযথ ভয় ও সম্ভ্রম লালন করবে। আল্লাহ তায়ালা কেবল মুত্তাকিদের কাছ থেকেই (ইবাদত) কবুল করেন।[১১]

ইবাদত মানে হলো, ইসলামের মূল বিষয়গুলো সর্বাগ্রে পালন করা। যে বিষয়গুলোকে ইসলামের খুঁটি বলা হয়, সেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া; যেমন : সালাত, সাওম, জাকাত, হজ। এ ছাড়াও ইবাদতের মধ্যে আরও রয়েছে আল্লাহর জিকির করা, তাসবিহ-তাহলিল-তাহমিদ পাঠ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

---

[৮] সূরা জারিয়াত : ৫৬-৫৮

[৯] সূরা নাহল : ৩৬

[১০] সূরা আম্বিয়া : ২৫

[১১] সূরা মায়েদা : ২৭

একজন মুমিন সর্বাবস্থায় তার রবকে স্মরণ করে। খাওয়াদাওয়া, ঘুমানো, ঘুমাতে যাওয়া, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ঘরের ভেতরে-বাইরে, সফরে, সফর থেকে ফিরে আসা, পোশাক পরিধান করা, খুলে ফেলা, এমনকি স্বামী-স্ত্রী সঙ্গে একান্তে সময় কাটানো—সবকিছুতে সে আল্লাহকে স্মরণ করে। একজন চিন্তাশীল মুসলিম কখনো কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভুলে যায় না—

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে।'[১২]

অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যেখানে সপ্তাহে একবার তাদের প্রভুর উপাসনা করে, মুসলমানরা সেখানে দিনে-রাতে অন্তত পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করে। তা ছাড়া সুন্নত ও নফল সালাতসহ অন্যান্য জিকির-আজকার তো রয়েছেই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا- وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا-

'হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবিহ পাঠ করো।'[১৩]

অতএব, একজন মুসলিমের সারাটা জীবনই ইবাদত। তার প্রতিটি কাজেকর্মে, চিন্তাচেতনায় সে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ; এমনকি যেসব কাজ সরাসরি ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেসব কাজের মধ্যেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজে।

চরিত্র ও নৈতিকতা

একজন মুসলিম হৃদয়ে ঈমান ধারণ করে, আর কাজেকর্মে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা বজায় রাখে। তার প্রতিটি কথায় থাকে বিশুদ্ধতার ছোঁয়া। নীতি-নৈতিকতা, দয়া ও ক্ষমা, আচার-আচরণ সবকিছুতে সে হবে এক উত্তম দৃষ্টান্ত। প্রতিটি কাজে সে নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কারণ, নবিজিকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন উত্তম আদর্শ বানিয়ে। আল্লাহই তাঁকে 'উত্তম চরিত্রের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই মুসলমানগণ নবিজির জীবন থেকে আলো নিয়ে নিজেদের আলোকিত করে। তাঁর দেখানো পথে চলে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে। এভাবে করে আল্লাহ চান তো, হাশরের ময়দানে সে নবিজির সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। যে আল্লাহর আদেশ পালন এবং নবিজির অনুসরণের মধ্য দিয়ে নিজের নফসকে দমন করতে শেখে, সে উপনীত হয় আধ্যাত্মিকতার আরও গভীরে। এভাবে তার নফসে আম্মারা পরিণত হয় নফসে লাওয়ামায়। মন-চাওয়া-জিন্দেগি পরিহার করে ব্যক্তি পৌঁছে যায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا-

---

[১২] সূরা আলে ইমরান : ১৯১

[১৩] সূরা আহজাব : ৪১-৪২

‘শপথ নফসের এবং তাঁর! যিনি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। সেই সফলকাম হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে করেছে পরিশুদ্ধ। আর সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে করেছে কলুষিত।’[১৪]

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, উত্তম আখলাক ও নৈতিকতা ঈমানের পূর্বশর্ত। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলছেন—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ- وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ- وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ- وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ- اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ- وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ-

‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত, যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে, যারা জাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত। কারণ, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা পূর্ণ করে।’[১৫]

নবিজিও আমাদের ঈমান, আমল ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেন—‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন পরিবারের বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে আঘাত না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান এনেছে, যে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।’

নবিজি আরও বলেন—‘ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা আছে। এদের সর্বোচ্চটা হলো “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই”—এ কথায় বিশ্বাস করা। আর সর্বনিম্নটা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।’

ইমাম বায়হাকি (রহ.) ঈমানের শাখা-প্রশাখা নিয়ে *আল জামি লি-শুআবিল ঈমান* নামে আলাদা একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি উত্তম আখলাক, চরিত্র, নৈতিকতা এবং যাবতীয় সৎকর্ম একত্রিত করেছেন। আর এসবকে তিনি সাব্যস্ত করেছেন ঈমানের রোকন হিসেবে। উপরিউক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটিই বোঝা যাচ্ছে।

আল্লাহর যথাযথ দাসত্বের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, পাপাচার থেকে বিরত থাকা যায় এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা সহজ হয়। যেমন : সালাতের ব্যাপারে কুরআন বলছে—

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ-

[১৪] সূরা শামস : ৭-১০

[১৫] সূরা মুমিনুন : ১-৮

‘নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’[১৬]

জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন—

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا-

‘তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করবে, যাতে তা দিয়ে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো।’[১৭]

হারাম জিনিসসমূহের ব্যাপারে কুরআন বলছে—

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

‘নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[১৮]

সাওমের ব্যাপারে সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে—‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং ফাহেশা কাজ থেকে বিরত হয় না, তার পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই।’ এ ধরনের মানুষের ব্যাপারে হাদিসে আরও এসেছে—‘এ রকম ব্যক্তির রোজা রাখা মানে হলো নিছক ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া। এ রকম ব্যক্তির নফল ইবাদত হলো নিছক রাত্রি জাগরণ।’

দ্বিমুখিতা ও দ্বিচারিতা মুসলমানের চরিত্র নয়। যেমন : ইহুদিরা নিজেদের মধ্যকার ব্যাবসায়িক লেনদেনে সুদি কারবার করে না। কিন্তু যখনই তারা বহিরাগত কারও সঙ্গে লেনদেন করে, তখন তাদের কাছে সুদ অবৈধ কিছু নয়! আবার পশ্চিমারা নিজ দেশে যতটা সভ্য ও ভদ্র, বাইরের দেশের কোনো নাগরিকের সাথে ততটাই অভদ্র ও অসভ্য। কিন্তু মুসলমানরা পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে যেমন ন্যায়পরায়ণ, তেমনি অপছন্দের ব্যক্তির সঙ্গেও। আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু সবার সঙ্গে তাদের একই আচরণ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা অথবা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র হয়, তবুও। কারণ, আল্লাহ তাদের উভয়ের নিকটবর্তী। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।’[১৯]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

---

[১৬] সূরা আনকাবুত : ৪৫

[১৭] সূরা তাওবা : ১০৩

[১৮] সূরা বাকারা : ১৭৩

[১৯] সূরা নিসা : ১৩৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ করার ব্যাপারে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো।'[২০]

আইন ও আইনের উদ্দেশ্য

একজন মুসলিম যেমন উত্তম আদর্শ ও নৈতিকতা ধারণ করবে, তেমনি তাকে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এসব নিয়মকানুন হলো এমন কিছু আইন—যা তাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। মানুষের জন্য যা কিছু বৈধ ও অনুমোদিত, যা কিছু অবৈধ ও নিষিদ্ধ, তার সবটাই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের অধিকার ও কর্তব্য; দায়িত্ব ও প্রয়োজন সবকিছু তিনি উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর আইন খেয়ালি কোনো নিয়ম নয়, যা একবার ডানে যায়, একবার বামে। আবার এগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোনো কিছু নেই; বরং আল্লাহর আইন হলো এক সরল পন্থা তথা সিরাতে মুসতাকিম। একজন মুসলিমকে আল্লাহর এই আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে হয়। তিনি যে বিষয়গুলোকে অবৈধ বলেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হয়। আবার যে বিষয়গুলোর বৈধতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কীভাবে ও কী পরিমাণে পালন করতে হয়, এ সবকিছুই তিনি বলে দিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো সাধারণত নিষিদ্ধ, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনের তাগিদে সীমিত পরিসরে সেগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন—

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

'তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয় কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার ওপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২১]

যেসব বিষয় আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, একজন মুসলিম কেবল তা-ই করবে। মন যা চায়, তা-ই করা একজন মুসলিমের জীবন হতে পারে না। তাকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের খাওয়াদাওয়া করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে বলে দেওয়া হয়েছে, বাজে জিনিস, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি খাওয়া যাবে না। একজন মুসলিম শুধু তা-ই খাবে, যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে। এমন কোনো কিছুই তার জন্য খাওয়া বৈধ নয়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

---

[২০] সূরা মায়েদা : ৮

[২১] সূরা বাকারা : ১৭৩